নীতিশাস্ত্র

দীক্ষিত গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

তৃতীয় অধ্যায়

পুরুষার্থ

[Puruṣārtha– A General View]

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে একটি নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডে মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের সেই কর্মই ভালো যা আমাদের ব্যক্তিগত সুখ অথবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুখ উৎপন্ন করে। নীতিবিদ্যা মানুষকে সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছে যা মানুষের ইহজীবনকে পরিপূর্ণ করে। নৈতিকতা একপ্রকার জাগতিক পরিপূর্ণতা। আবার কোন কোন নীতিদার্শনিক মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধির নির্দেশের মধ্যে নৈতিকতাকে সন্ধান করেছেন। বুদ্ধির এই নির্দেশের দ্বারা তাঁরা মানুষের জাগতিক কর্মের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। নৈতিক আদর্শের স্বরূপ বা উৎস যাই হোক না কেন পাশ্চাত্য নীতিদর্শন মানুষকে দেখেছে দেশ-কাল ও কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবরূপে যার জীবন নৈতিক সার্থকতা লাভ করে এই জগতের মধ্যেই।

মূল কথা এই যে ব্যক্তি-মানুষের পার্থিব সুখ বা বৃহত্তর সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে অতিজাগতিক কোন আদর্শের স্থান নেই। এই দর্শনে নৈতিক আদর্শ মানুষকে জগৎকে অতিক্রম করে অন্য কোন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের আহ্বান জানায় না। এখানেই ভারতীয় নীতিদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের পার্থক্য। ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতার আদর্শ এই জগতে বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একথা বোঝার জন্য ভারতীয় দর্শনের সামগ্রিক চরিত্রটি জানা প্রয়োজন।

'দর্শন' শব্দটি 'দৃশ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ 'দেখা' বা 'জানা'। কিন্তু যে কোন বস্তুকে দেখা বা জানাই দার্শনিক জ্ঞান নয়। দার্শনিক জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। দার্শনিক জিজ্ঞাসা হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই তত্ত্বের স্বরূপ কি? ভারতীয় দার্শনিকের মতে এই তত্ত্ব আসলে আত্মতত্ত্ব। তাই আত্মদর্শনকেই এখানে তত্ত্বদর্শন বলা হয়। এই জ্ঞান বা দর্শন

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসে না। কারণ তত্ত্বদর্শনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সকল ব্যবধান ঘুচে যায়। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে তত্ত্বভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মানুষ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করে।

পাশ্চাত্যে গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে মানুষের জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার পিছনে মানুষের জীবনকে সমুন্নত করার নির্দিষ্ট প্রয়াস আমরা লক্ষ করি যার সামনে ছিল একটি আধ্যাত্মিক ধ্রুবতারা। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে পার্থিব সুখলাভের আদর্শ থেকে পৃথক করেছেন। যে নৈতিক আদর্শ মানুষকে সুখ-দুঃখের পরপারে নিয়ে যায়, যা আত্মোপলব্ধির মহিমায় ভাস্বর তাই ভারতীয় দর্শনে শ্রেয় নামে অভিহিত হয়েছে। আত্মোপলব্ধি মানুষের শ্রেয়। জাগতিক তৃপ্তিকে বলা হয়েছে 'প্রেয়'। প্রেয়লাভের ফলে আত্মোপলব্ধি হয় না। যে ব্যক্তি প্রেয় ও শ্রেয়ের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত তিনিই প্রাজ্ঞ। বিভিন্ন নৈতিক আদর্শে যে মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে তা এইভাবে দুটি ভিন্ন বর্গের আদর্শ।

সুতরাং একথা অবশ্যই বলা চলে যে ভারতীয় নীতিবিদ্যা মানুষকে শুধু যে সুন্দর চরিত্র লাভের অধিকারী করতে চেয়েছে তাই নয়। তাকে যুক্তির পথে এগিয়ে যেতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার পঞ্চশীল বা অহিংসাব্রত, অথবা জৈন নীতিবিদ্যার অনুব্রত মূলত সাধারণ মানুষকে চরিত্রবান করার নীতি। যে কোন মানুষের পক্ষে হয়তো মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। তবে মুক্তিকামী মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রয়োজন আছে। যেমন, যে ব্যক্তি শীল আচরণ করে না বা অহিংস নয় তার পক্ষে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। জৈন নীতিবিদ্যায় অনুব্রতের উচ্চতর পর্যায়ে আছে মহাব্রতের অনুশাসন যা মানুষকে ক্রমশ মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। নির্বাণ বা মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নীতিবিদ্যার আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়, তার নৈতিকতারও আদর্শ। তাই যেখানেই ভারতীয় দার্শনিক নৈতিক আদর্শের কথা বলেছেন সেখানেই তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন এক আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে। নৈতিক আদর্শ তাই ভারতীয় দর্শনে শুধুই সামাজিক আদর্শ নয়। ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এইভাবে আধ্যাত্মিকতায় পরিণতি লাভ করেছে।

পুরুষার্থ

ভারতীয় দর্শনে মানবজীবনের একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে যাদের একত্রে বলা হয় 'পুরুষার্থ'। 'পুরুষার্থ' কতকগুলি আদর্শ যা মূলত নৈতিক।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে বলা হয় যে মানুষ যা প্রার্থনা করে, যে আদর্শকে তার কাম্য বা অভীষ্ট বলে মনে করে তাই পুরুষার্থ। মীমাংসাসূত্রে বলা হয়েছে— 'যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিঙ্গার্থলক্ষণম্।' অর্থাৎ যেখানে বা যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি নিহিত থাকে তার কামনাই পুরুষার্থ।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অবশ্য পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। অনেকের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। কোন কোন প্রাচীন রচনায় এই ত্রিবর্গকেই পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে চতুর্থ পুরুষার্থ 'মোক্ষ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়।

চার্বাক দার্শনিকের কাছে 'কাম'ই একমাত্র পুরুষার্থ। 'অর্থ' কাম চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। যারা ত্রিবর্গ স্বীকার করেন তাঁদের মতে শুধু অর্থ নয়, ধর্মও কামসিদ্ধির উপায়; অর্থাৎ এই মতে কামই আসল লক্ষ্য। যারা চতুর্বর্গে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে মোক্ষই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষলাভের উপায়। ত্রিবর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে অনেক ধর্ম ও অর্থকে কামের তুলনায় শ্রেয় বলেছেন। আবার অনেকের কাছে কাম ও অর্থই শ্রেয়। কারও কারও দৃষ্টিতে ধর্মই একমাত্র শ্রেয়।

চতুর্বিধ পুরুষার্থ আমাদের প্রার্থিত কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি মানুষের মুখ্য প্রয়োজন। বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পুরুষার্থই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির উপায়। একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষ পার্থিব সুখেরই কামনা করে। 'কাম' শব্দটি জৈব তৃষ্ণার নিবৃত্তিজনিত সুখকে বোঝায়। জৈব কামনা পরিতৃপ্ত হলে সুখ উৎপন্ন হয়। অর্থ সাক্ষাৎভাবে সুখ উৎপাদন না করলেও তার দ্বারা কাম তৃপ্ত হয়।

অর্থ ও কাম মানুষের দুটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম। বৈদিক ভাবনা অনুসারে পার্থিব ভোগস্পৃহা নিন্দনীয় হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে অবশ্য অসংযত ভোগলিপ্সাকে অনুমোদন করা হয়নি। অর্থ ও কাম যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তখন যে সুখ লাভ হয় তাই কাম্য। যাই হোক, অর্থ ও কাম যে পুরুষের অভীষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ধর্মকে কেন পুরুষার্থ বলা হয়েছে তা বিচার করা প্রয়োজন।

ধর্মকে কি আমরা কামনা করি? এখানে মনে রাখতে হবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রটি কি। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আনাই ধর্মের কাজ। যে ব্যক্তি কাম এবং অর্থকে আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি প্রকৃত সুখ লাভ করেন না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে

অর্থ ও কাম ধর্ম থেকেই আসে— 'ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ।' একথার অর্থ হল অর্থ ও
কাম ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হলেই তা পুরুষার্থরূপ আদর্শরূপে গ্রাহ্য হয়। তাই
ধর্মকে সুখের উপায় বলা হয়েছে। আসলে একমাত্র কামই মুখ্য পুরুষার্থ। কাম এবং
কিছু লাভের উপায় নয়। কামের স্বগত মূল্য আছে। কিন্তু অর্থ ও ধর্ম এই দিক থেকে
গৌণ পুরুষার্থ— কারণ তারা সুখলাভের উপায়। ধর্ম ও অর্থ কামের সহায়ক

সুতরাং ত্রিবর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই তিনটি পুরুষার্থ একপ্রকার নয়
তাদের মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ। একমাত্র কামই মুখ্য; অর্থ ও ধর্ম গৌণ। কিন্তু
চতুর্বর্গের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলেছেন। ত্রিবর্গের অন্তর্গত
পুরুষার্থগুলি মোক্ষেরই সহায়ক। ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম মানুষকে
মোক্ষাভিমুখী করে। এই দিক থেকে বিচার করলে মোক্ষকেই মুখ্য পুরুষার্থ বলা উচিত

যদিও বলা হয় যে পুরুষার্থগুলি আমাদের কাম্য বা অভীষ্ট অর্থাৎ প্রতিটি
পুরুষার্থই সুখপ্রাপ্তির সহায়ক তাহলেও একথা গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। ধর্ম, অর্থ ও
কাম মানুষের কামনা সিদ্ধ করে এবং সুখ উৎপাদন করে। কিন্তু মোক্ষ কামনার
অতীত অবস্থা। মোক্ষাবস্থায় কামনার সিদ্ধি ও তজ্জনিত সুখলাভের অবকাশ নেই
তাই মোক্ষ ত্রিবর্গকে পূর্ণতা দান করে একথা সত্য নয়। ত্রিবর্গ এবং মোক্ষের মধ্যে
স্বরূপগত ব্যবধান আছে।

এই আশঙ্কার উত্তরে অনেকে বলেছেন যে মোক্ষ কামনাশূন্য অবস্থা হলেও তার
সঙ্গে ত্রিবর্গের আত্যন্তিক ব্যবধান আছে একথা মনে করার কোন হেতু নেই। যে
কাম ও অর্থ ধর্মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ তার সিদ্ধিকেই মানুষের জীবনধারণের সহায়ক
বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে কাম এবং অর্থের গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করা হয়নি।
তার কারণ হিন্দু দার্শনিক চিন্তায় জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান
স্বীকার করা হয়নি। তার কারণ এই মতে কামের সিদ্ধি যদি ধর্মবিরোধী না হয়
তাহলে তাই মানুষকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ
নিজেকে কামস্বরূপ বলেছেন যা অবশ্যই ধর্মবিরোধী নয় (৭-১১)। কৌটিল্য তাঁর
অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই সাধনা করা উচিত। কিন্তু অর্থ
ও কাম যদি ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী হয় তাহলে তাদের পরিত্যাগ করা উচিত।
এর থেকে বোঝা যায় যে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থই প্রকৃত পুরুষার্থ এবং
তাদের সাধনাই মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করে তুলতে পারে। সুতরাং ত্রিবর্গের
সম্পূর্ণতা মোক্ষেই— একথা বলা অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

অনেক ভাষ্যকার এখানে একটি সমস্যা লক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে ধর্ম, অর্থ
ও কামের সঙ্গে মোক্ষের ধারণার এক জায়গায় বৈসাদৃশ্য আছে। ধর্ম এবং
ধর্মনিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। ধর্ম সমাজকল্যাণের

আদর্শে কাম ও অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা হয় সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণই
ধর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু মোক্ষে অহংবোধেরই বিনাশ হয়। সেখানে সুখ বা
কল্যাণসন্ধানী মানুষের জৈবসত্তার বাস্তবতা বিলীন হয়ে যায়। মোক্ষে সেই পুরুষ বা
আত্মাই বিরাজ করে যা সুখ-দুঃখ বাসনা-তৃষ্ণার অতীত। মোক্ষ তাই ত্রিবর্গের সঙ্গে
তুলনীয় নয়।

এই আলোচনায় মোক্ষের যে ধারণাটি গৃহীত হয়েছে সেটি বহু আলোচিত প্রাচীন
ধারণা। এই প্রাচীন ধারণা অনুসারে মোক্ষাবস্থায় সমস্ত কামনার লয় হয় এবং ব্যক্তির
অহংবোধ মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রাচীন মতকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে যার
ফলে ত্রিবর্গ ও মোক্ষের দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান ঘুচে যায়। আমরা মনে করতে পারি যে মোক্ষে
মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রাকৃত রূপ মিথ্যা হয়ে যায় না; বরং মোক্ষাবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বের
অভাবনীয় প্রসারণ ঘটে। যে কোন জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনে আত্মার এই প্রসারকে
দেখি যেখানে জৈব বা প্রাকৃত অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা থাকলেও একজন মানুষ মুক্ত
থাকেন। তিনি বাসনারহিত নন। কিন্তু তাঁর বাসনা এই প্রাকৃত জীবন যাপনের বাসনা
নয়। তাঁর বাসনা মুক্তির বাসনা যা জাগতিক বন্ধনের মধ্যেও বন্ধনহীন থাকে। সুতরাং
মোক্ষকে ত্রিবর্গের সঙ্গে অযৌক্তিক সংযোজন বলা হয়তো সঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অভিযোগের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন কোন মতে
ধর্ম, অর্থ ও কামকে সামাজিক আদর্শ বলে মনে করা হয়। কিন্তু মোক্ষের কোন
সামাজিক তাৎপর্য নেই। মোক্ষ একজন মুমুক্ষু ব্যক্তির আদর্শ হতে পারে। সেক্ষেত্রে
একথা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে মোক্ষের সংযোজন পুরুষার্থ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ
করে না। আবার একথাও সত্য যে ধর্ম যদি মোক্ষের সহায়ক হয় তাহলে তার
সামাজিক মূল্য থাকে না। মোক্ষাবস্থায় পুরুষের অবস্থাও একথাকে সমর্থন করে। যে
মোক্ষলাভ করে সে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব সকল সামাজিক তাৎপর্য হারায়। কারণ
মোক্ষ শুভাশুভের অতীত। এই অভিযোগের উত্তর আমরা পেয়েছি। মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ
যতদিন বিদেহমুক্ত না হয় ততদিন তার জীবন্মুক্ত অবস্থা যে সামাজিক মূল্য লাভ
করে একথা বুদ্ধদেব বা অন্যান্য জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনেই প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্ম

পুরুষার্থসমূহের মধ্যে ধর্ম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'ধর্ম' শব্দটি যদিও নানার্থবোধক
তাহলেও এর একটি মুখ্য অর্থ আছে। 'ধর্ম' শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ হল 'ধারণাৎ
ধর্মম্ ইত্যাহুঃ'— অর্থাৎ ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে।

'ধর্ম' শব্দটি এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ'। ধর্মের [illegible] হয়েছে 'সর্বস্য ধারকম্'— ধর্ম সবকিছুকেই ধারণ করে। ভারতীয় চিন্তা[illegible] অনুযায়ী ধর্ম প্রতিটি মানুষকে ধারণ করে এবং তার ফলে সমগ্র মানব সমাজ[illegible] ধারণ করতে সমর্থ হয়। ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য [illegible] ধর্মপালন করা কর্তব্য।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ
স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।

অর্থাৎ বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি, শিষ্ট ব্যক্তির আচরণ এবং আত্মতুষ্টি— এই চারটি ধর্মের বৈশিষ্ট্য। নৈতিকতার নির্ণায়ক বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার ছাড়াও বিবেকের অনুমোদনকে ধর্মের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আত্মতুষ্টি' শব্দটি অন্তর[illegible] বিবেকের অনুমোদনকে বোঝায়।

একটি প্রয়োগ অনুযায়ী ধর্মের অর্থ 'ব্যবহার' যা সমাজে মানুষের কর্তব্য[illegible] বোঝায়। মেধাতিথি এই অর্থে ধর্মকে বলেছেন 'কর্তব্যতা'। কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি মানুষ ও সমাজকে ধ্বংস করে। ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'ধর্ম এব হতো হন্তি [illegible] রক্ষতি রক্ষিতঃ'— ধর্ম বিনষ্ট হলে বিনাশকারীকে বিনাশ করে, আর ধর্ম রক্ষিত হলে রক্ষা করে। ধর্ম যে শুধু অবশ্যপালনীয় তাই নয়। পুরুষার্থসমূহের ভিত্তি [illegible] ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ধর্মকে উপেক্ষা করে অর্থ বা কাম, এমনকি মোক্ষের সাধনা করা যায় না।

সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্ণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপনের জন্য ধর্মকে একটি সামাজিক ও নৈতিক বিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে। [illegible] আধুনিক পরিভাষায় যাকে justice বা ন্যায়ধর্ম বলা হয় তাকেই ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বলা হয়েছে।

ধর্মের এই সামাজিক তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যায় যে ধর্ম যেন একটি শৃঙ্খলাসূত্র। যদিও 'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় শাস্ত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলেও আমরা দেখি যে পরাতাত্ত্বিক অর্থে ধর্মকে অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশ্বনীতি (cosmic law) রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা 'ঋত' নামে পরিচিত। 'ঋত' বিশ্বজগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার একটি নীতি। বিশ্বের নানা শক্তিকে একসূত্রে গ্রথিত করে সৃষ্টিকে এক অখণ্ড বিশ্বে (universe) পরিণত করে এই শক্তি বা নিয়ম (law)। 'ধর্ম' শব্দটির একদিকে যেমন এই পরাতাত্ত্বিক প্রয়োগ আছে সেই রকম তার একটি

নৈতিক তাৎপর্যও আছে। ধর্ম একটি নৈতিক বিধি যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম একটি নীতি যা ব্যক্তিকে সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজের কল্যাণের মধ্যেই মানুষের শুদ্ধি ঘটে।

মানুষের বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে ধর্মই নিয়ন্ত্রক। যেমন, কাম ও অর্থ এই দুটি পুরুষার্থ হলেও তা যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে মানুষ বিপথগামী হতে পারে এবং তার ফলে সামাজিক কল্যাণ বিঘ্নিত হতে পারে। কাম পুরুষার্থ হলেও তা কল্যাণকর হয় যদি তা ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী না হয়। অর্থ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত না হলে অর্থও অনর্থের মূল হতে পারে। সহজ কথায় বলা যায় যে কাম ও অর্থ এদুটি পুরুষার্থ ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেই মানুষ যথার্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারবে। ত্রিবর্গকে বুঝতে হবে সমাজের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে ধর্মের ধারণাটি পরাতাত্ত্বিক ধারণারূপে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। 'ধর্ম' শব্দটির কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। বরং এটি একটি প্রধান নৈতিক ধারণা। 'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের কর্তব্যকে (duty) বোঝায়। এই কর্তব্য শুধু নৈতিক নয়। এর একটি সামাজিক দিক আছে। এ কথার অর্থ এই যে মানুষ যে শুধু নৈতিক কর্তারূপে ধর্ম বা কর্তব্য পালন করে তা নয়, সমাজে তার আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারিত হয়। 'আশ্রম' শব্দটি জীবনযাপন প্রণালীকে বোঝায়। মহাকাব্য ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে চারটি আশ্রমের উল্লেখ আছে— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এগুলি যেন মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়। এই বিভিন্ন পর্যায় ভেদে মানুষের কর্তব্য নির্ধারিত হয়। আবার 'বর্ণ' শব্দটি মানুষের মানসিক প্রবণতাকে বোঝায়। এই প্রবণতা অনুসারে মানুষকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

একদিকে যেমন সমস্ত মানুষের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে, সেইরকম তার আরও কতকগুলি বিশেষ ধর্ম বা কর্তব্য আছে যা তার আশ্রম ও বর্ণ সাপেক্ষ। সাধারণ ধর্মগুলি মানুষ মাত্রেরই পালনীয়। এই সমস্ত ধর্মে নৈতিকতার যে আদর্শ গৃহীত হয়েছে তা আশ্রমনিরপেক্ষ, বর্ণনিরপেক্ষ। এখানে নৈতিক কর্তব্য বিচারে কোন মানুষের বিশেষ সামাজিক অবস্থান বিচার করা হয় না। মানুষ হিসাবেই মানুষের যা কর্তব্য তাই সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনুজ্ঞা আরোপ করা হয় তা নিঃশর্তভাবে পালনীয়। অনুজ্ঞার এই আবশ্যিকতা কান্টের নীতিদর্শনের শর্তহীন অনুজ্ঞার সঙ্গে তুলনীয়। তবে সাধারণ ধর্ম কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞার মতো বুদ্ধিপ্রসূত নয়, বরং তারা ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধান যা আশ্রম বা বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য। পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্ম বা কর্তব্যতার ধারণাকে বিচার করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ভারতীয় নীতিদর্শনে কর্তব্যতার ধারণাটি পরিণাম সাপেক্ষ (consequential)। তার কারণ ধর্মপালন মানুষকে মোক্ষাভিমুখী করে। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং ধর্ম তার উপায়।

কিন্তু এই কারণেই ধর্মের ধারণাকে পরিণাম সাপেক্ষ বলা উচিত নয়। ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন যে ধর্ম বা নৈতিক কর্ম মানুষকে পরম লক্ষ্যে বা মোক্ষে পৌঁছে দেয়। তবুও মোক্ষের সহায়ক হওয়া ধর্মের কর্তব্যতা বা নৈতিকতার মানদণ্ড নয়। ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি অন্যত্র নিহিত। ধর্মাচরণ নৈতিক কারণ তা ঈশ্বর নির্দিষ্ট বা শাস্ত্রবিহিত। ধর্মসূত্র বা ধর্মশাস্ত্রই ধর্মের নৈতিকতার প্রমাণ। ভারতীয় দার্শনিক একথা বলে না যে যা মোক্ষের সহায়ক তাই নৈতিক। বরং আমরা একথাই পুনরাবৃত্তি শুনি যে বৈদিক অনুশাসনই কর্মের নৈতিকতার প্রমাণ। যেমন মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে যে বেদবিহিত নয় এমন কোন কিছুই কর্তব্য হতে পারে না।

সুতরাং কর্মের পরিণাম তার নৈতিকতার প্রমাণ নয়। ধর্মাচরণ নৈতিক কারণ তা আমাদের শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য। ধর্মপালনের পরিণামে সুখপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুখলাভের সহায়ক হওয়া ধর্মের মানদণ্ড নয়। ধর্মাচরণ সুখ প্রদান না করলেও তার নৈতিকতার হানি হয় না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন 'নাহম্ ধর্মফলাকাঙ্ক্ষী'— 'ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমি ফলের প্রত্যাশা করি না।' যুধিষ্ঠির ধর্মাচরণ করেছিলেন কারণ বেদের নির্দেশ লঙ্ঘন করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে— 'ধর্ম বাণিজ্যকো হীন জঘন্যো ধর্ম-বাদিনাম্'। যাঁরা ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় ধর্মাচরণ করেন তাঁরা ধর্ম নিয়ে বাণিজ্য করেন। তাঁরা নীচ এবং তাঁরা ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারেন না। কর্তব্য পালনের জন্যই কর্তব্য পালন করা উচিত। ধর্মের পরিণাম নিরপেক্ষ (deontological) নৈতিকতার প্রমাণ এখানে স্পষ্ট। লক্ষণীয় যে ধর্ম মোক্ষের সহায়ক নয় একথা বলা ভারতীয় নীতিদার্শনিকদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা ধর্মপালনের স্বগত মূল্যের কথাই বলেছেন যার উৎস ঈশ্বর ও বেদাদি শাস্ত্র।

ধর্মের বিভাগ

মনু সর্বপ্রথম ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন— সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। সাধারণ ধর্ম সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের আচরণীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম মানুষের সামাজিক অবস্থান সাপেক্ষ।

সাধারণ ধর্ম— মনু সংহিতায় মানুষের নিত্যিয় সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ।

ধৃতি— নিজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই ধৃতি।

ক্ষমা— অপরাধ মার্জনা। অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে তার মধ্যে অনুশোচনা আসে এবং তার সংশোধন হয়।

দম— সহনশীলতা।

অস্তেয়— অন্যের দ্রব্য অপহরণ না করা অথবা তার প্রতি লোভ না করা।

শৌচ— পরিচ্ছন্নতা; দৈহিক ও মানসিক শুচিতা।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ— ইন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ধী— বিচারশক্তি, জ্ঞান বা বুদ্ধি।

বিদ্যা— জগৎ সম্পর্কে তথ্যমূলক জ্ঞান।

সত্য— বিশ্বে যে নৈতিক শক্তি বা ঋত তারই প্রকাশ হয় সত্যে। ঋতের মতোই সত্য অপরিণামী।

অক্রোধ— ক্রোধশূন্যতা।

মনু অন্যত্র এছাড়াও আরও কিছু কিছু সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করেছেন, যেমন, অকার্পণ্য, অহিংসা, ইত্যাদি।

বর্ণ ও আশ্রম নির্বিশেষে যে কোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে এই ধর্মগুলিকে সাধারণ ধর্ম বলা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি ধর্ম বা কর্তব্যই ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধির জন্য পালনীয়। অনেকে যদিও উল্লিখিত ধর্মগুলির সামাজিক মূল্য আবিষ্কার করেছেন তাহলেও ভারতীয় নীতিবিদ্যায় সমাজের উন্নতি বা মঙ্গল সাধনের জন্য এই ধর্মগুলিকে আচরণীয় বলা হয়নি। মনে হয় যে ভারতীয় দর্শনে মনু প্রভৃতির রচনায় ব্যক্তিমানুষের উন্নতি বা শুদ্ধিই প্রধানত বিবেচ্য ছিল। নিষ্ঠা, সহনশীলতা, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে একথা স্পষ্ট। জ্ঞান, বিদ্যা ও সত্য আচরণ ব্যক্তি মানুষের পরিশুদ্ধির জন্যই পালনীয়। মনুর রচনায় সমস্ত ধর্মই যেন আত্মশুদ্ধির উপায়।

আপস্তম্ব বিভিন্ন সাধারণ ধর্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ভিন্ন। তিনি প্রথমে বিভিন্ন অধর্মের উল্লেখ করেছেন এবং তারপরে তার বিপরীত বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করেছেন। ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, দম্ভ, দ্রোহ, মিথ্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, কাম, অযোগ বা মনঃসংযোগের অভাব ইত্যাদি অধর্মের অন্তর্গত। বিপরীতক্রমে ক্রোধশূন্যতা, দ্বেষ শূন্যতা, সত্যবাদিতা, মিতাহার, অপরিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, সকল প্রাণীর সঙ্গে অবিরোধ, অহিংসা ইত্যাদি ধর্ম সকল মানুষের আচরণীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনুর মতো প্রশস্তপাদও ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। সামান্য ধর্ম সকল মানুষের পালনীয়। বিশেষ ধর্মের পালন সামাজিক অবস্থান সাপেক্ষ। প্রশস্তপাদ নিম্নলিখিত সামান্য ধর্মগুলির উল্লেখ করেছেন— ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব, সত্যবচন, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অনুপধা, ক্রোধবর্জন, স্নান ও অভিসেচন, শুচিদ্রব্য সেবন, বিশিষ্ট দেবতা ভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত ধর্মপালনের জন্য কর্তার সঙ্কল্প থাকা প্রয়োজন। একথার তাৎপর্য এই যে বিভিন্ন কর্ম থেকে বাহ্য আচরণকে নিবৃত্ত করে অধর্ম পরিহার করা যায়; কিন্তু তার দ্বারা ধর্ম উৎপন্ন হয় না। যেমন, অহিংসা শুধুমাত্র হিংসাভাব নয় অর্থাৎ হিংসা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই অহিংসার অর্থ নয়। প্রাণীসমূহকে আঘাত না করার সঙ্কল্পই প্রকৃত অহিংসা।

একইভাবে 'অস্তেয়' শব্দের অর্থ পরদ্রব্য অপহরণ না করা। কিন্তু চৌর্য থেকে নিবৃত্তি বা বিরতি অস্তেয়ের সম্পূর্ণ অর্থ নয়। অস্তেয় একপ্রকার সঙ্কল্পকে বোঝায় যার অর্থ মনের মধ্যে এই চিন্তাকে লালন করা যে পরদ্রব্য অপহরণ করা আমার কর্তব্য নয়। ব্রহ্মচর্য সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে এখানে শুধুমাত্র যৌন প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি বোঝায় না; এই জাতীয় প্রবৃত্তিকে চিন্তায় প্রশ্রয় না দেওয়াই ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ।

আবার 'অনুপধা' শব্দটি ভাবশুদ্ধিকে বোঝায়। সর্ববিধ দম্ভ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি যদি কর্তব্য পালনের অভিপ্রায় হয় তাহলে তা বর্জন করতে হবে। যে কর্তব্য কেবলমাত্র শুদ্ধ অভিপ্রায়ের দ্বারা কৃত তাই ধর্মসাধনের উপযোগী। ক্রোধ বর্জনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বাহ্য আচরণে ক্রোধ বর্জনই যথেষ্ট নয়, ক্রোধ ত্যাগের সঙ্কল্পই প্রকৃত ধর্ম।

লক্ষণীয় যে প্রশস্তপাদ যে সমস্ত সামান্য ধর্মের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব ও অপ্রমাদ— এই কটি ধর্ম মনুকথিত ধর্মাবলীতে অনুপস্থিত। প্রশস্তপাদ কথিত অহিংসা ও ভূতহিতত্ব মানুষকে সঙ্কীর্ণ আত্মবোধ অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মে শ্রদ্ধা এবং অপ্রমাদ অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অবশ্য পালনীয়তার উল্লেখ একথাই বোঝায় যে প্রশস্তপাদ নৈতিক চেতনাকে সদাজাগ্রত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নৈতিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রমাদ বা অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

বিশেষ ধর্ম আলোচনার আগে একটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন। বিশেষ ধর্ম— যা মানুষের জীবনের নানা অবস্থান বা পর্যায়সাপেক্ষ— সেই ধর্ম পালনের জন্য সামান্য ধর্মকে লঙ্ঘন করার কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ শাস্ত্রকারগণ বিশ্বাস করেছেন যে পৃথিবীতে একটি মানবসমাজ আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন

কতকগুলি সম্পর্ক আছে যাকে কোন বিশেষ ধর্মের স্বার্থেই বিসর্জন দেওয়া যায় না। বরং সামান্য ধর্মকেই বিশেষ ধর্মের ভিত্তি বলা চলে। সামান্য ধর্মগুলি সকল মানুষের সার্বজনীন কর্তব্য। এখানে জাতি, বর্ণ, আশ্রম অর্থাৎ মানুষের সামাজিক অবস্থানের কোন প্রসঙ্গ নেই।

বিশেষ ধর্ম— বিশেষ ধর্মগুলি মানুষের সার্বজনীন কর্তব্য নয়। বিশেষ বিশেষ মানুষের স্বভাব, সামাজিক অবস্থান এবং জীবনের নানা পর্যায় ভেদে বিশেষ ধর্মগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিশেষ ধর্মগুলি দু-প্রকার— (ক) বর্ণধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী কর্তব্যসমূহ এবং (খ) আশ্রমধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন আশ্রমের উপযোগী ধর্ম।

বর্ণধর্ম

মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানগত ধর্মের মধ্যে একটির নাম বর্ণধর্ম। 'বর্ণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ রঙ (colour)। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে এই শব্দটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে বোঝায়। মানুষের এই মানসিক প্রবণতা তার একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতার উপর তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের মতো মানুষও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ আছে। তবে কোন পদার্থের মধ্যেই এই ত্রিগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে না। যে কোন পদার্থে একটি গুণ প্রধান হয় এবং অপর দুটি গুণ অপ্রধান হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

প্রতিটি গুণের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। সত্ত্বগুণের স্বভাব জ্ঞানবত্তা। রজঃ গুণের স্বভাব চলমানতা বা চঞ্চলতা। তমঃ গুণ জড়স্বভাব।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ত্রিগুণ থাকলেও সকলের মধ্যে একই গুণ প্রধান নয়। কোন মানুষ সত্ত্বপ্রধান, কোন মানুষ রজঃপ্রধান এবং কোন মানুষ তমঃপ্রধান হতে পারে। গুণের প্রাধান্যের এই ভেদের ভিত্তিতে বর্ণভেদ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চতুর্বর্ণ গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছে।

বর্ণবিভাগের উৎপত্তি

মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানগত ধর্মের মধ্যে একটির নাম **বর্ণধর্ম**। মানবজাতিকে যে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের বিশেষ ধর্মকেই

বর্ণধর্ম বলা হয়। কিন্তু বর্ণবিভাগের ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর বর্ণধর্মের যৌক্তিকতা নির্ভর করছে। সুতরাং বর্ণধর্মের আলোচনার আগে বর্ণবিভাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজে বর্ণব্যবস্থা শ্রমবিভাজনের ফল। সমাজের প্রয়োজন ও মানুষের সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন কর্মভার অর্পণ করা হয়। প্লেটোর রচিত 'রিপাবলিক' নামক সংলাপে অনুরূপ সামর্থ্যভিত্তিক বিভাগের উল্লেখ আছে। মানুষের বিভিন্ন সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্লেটো তাঁর রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাষ্ট্রনায়ক (Guardians), যোদ্ধা (Auxiliary) এবং উৎপাদক (economic or producing class)— এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। নাগরিকদের এই সামর্থ্য প্লেটোর মতে জন্মগত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে মানুষের সামর্থ্যের পরিবর্তন হতে পারে। শূদ্রের পক্ষেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অসম্ভব নয়।

বর্ণভেদ সামর্থ্যভিত্তিক— এইরকম মতবাদ প্রচলিত থাকলেও অপর একটি মত অনুসারে বর্ণের বিভাগ জন্মের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণ বংশে জাত সন্তানই ব্রাহ্মণ হয়— তার সামর্থ্য বা যোগ্যতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

অপর একটি মত অনুসারে বর্ণের এই চতুর্বিধ বিভাগ ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয়েছিল বাহুদ্বয় থেকে। বৈশ্যের উদ্ভব উরুদেশ থেকে এবং শূদ্রের উদ্ভব হয়েছিল পদদ্বয় থেকে। প্রতিটি অঙ্গের যেমন গুরুত্ব আছে সেইরকম প্রতিটি বর্ণেরও সামাজিক প্রয়োজন আছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনিই গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্মবিভাগশঃ (গীতা ৪/১৩)। অর্থাৎ মানব প্রকৃতির বৈষম্য অনুসারেই বর্ণবিভাজন হয়েছে। বর্ণবিভাগ মানুষের প্রকৃতিগত। সত্ত্ব রজ ও তম— এই তিনটি গুণের বৈষম্য অনুসারে মানবজাতি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। শঙ্কর তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন যে ব্রাহ্মণ সত্ত্ব প্রধান অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য দুটি গুণের তুলনায় সত্ত্ব প্রধান। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে রজগুণ প্রধান। বৈশ্যগণ রজ ও তমঃপ্রধান। শূদ্রবর্ণের মানুষ তমঃপ্রধান। বিভিন্ন বর্ণের মানুষের প্রকৃতি অনুসারে কতকগুলি কর্মের প্রবণতা জন্মে। যেমন, ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বপ্রধান। সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় শম, দম প্রভৃতির মধ্যে। সেইরকম রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়ের শৌর্য-বীর্য, রজঃ ও তমঃ প্রধান বৈশ্যের শ্রমসহিষ্ণুতা অর্থোপার্জন প্রবৃত্তি এবং শূদ্রের জড়তা ও পরনির্ভরতা তাদের নিজনিজ গুণের

প্রকাশ। প্রকৃতিগত এইরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন বর্গের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কমপ্রবর্ণতা ও উপযোগিতা দেখা যায়। যেমন,

(ক) ব্রাহ্মণের পালনীয় কর্ম— যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপনা, পরিগ্রহ বা দান গ্রহণ ও আস্তিক্য।

(খ) ক্ষত্রিয়ের পালনীয় কর্ম— প্রজাপালন, অসাধু নিগ্রহ, যুদ্ধে পরাঙমুখ না হওয়া।

(গ) বৈশ্যের পালনীয় কর্ম— বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন ইত্যাদি বৈষয়িক ক্রিয়া।

(ঘ) শূদ্রের পালনীয় কর্ম— অন্য বর্ণভুক্ত মানুষের সেবা ও পরিচর্যা।

বর্ণধর্মগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির সামাজিক মূল্য অপরিসীম। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষের চতুর্বিধ বর্ণের মতো সমাজের প্রয়োজনও চতুর্বিধ। সমাজকে যদি সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হবে, তার নাগরিকদের সেবা করতে হবে এবং তাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের যে সমস্ত কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত কর্তব্য বা ধর্ম সমাজের এই বিভিন্ন দাবীকে পূরণ করতে সক্ষম। শূদ্রগণ সমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকবে, বৈশ্য তার অর্থনীতিকে পুষ্ট করবে, ক্ষত্রিয় তার শক্তি ও শৌর্যের সাহায্যে সমাজকে সুরক্ষিত রাখবে এবং ব্রাহ্মণ তার প্রজ্ঞার আলোকে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। ধর্মমাত্রই শাস্ত্রবিহিত। তাই মনু বা প্রশস্তপাদ কথিত সাধারণ ধর্মগুলিকে কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এই ধর্মের ব্যতিক্রম অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ অনেক পরিস্থিতিতে ধর্মপালন অধর্মপালনের তুল্য বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে যিনি ধর্মাচরণ করেন তাঁকে আর ধার্মিক বলে মনে হয় না— যেমন, সত্যকথন। যেখানে অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেখানে সত্য কথা না বলাই নৈতিক দিক থেকে সঙ্গত। মহাভারতে কৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। সাধু কৌশিক ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। একদিন কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে একজন পথিকের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে কৌশিকের সঙ্গে পথিকের সাক্ষাৎ হয়। পথিক অনুরোধ করে তিনি যেন দুর্বত্তদের নিকট তার গতিপথ এবং অবস্থান প্রকাশ না করেন। সত্যবদ্ধ সন্ন্যাসী দুবৃত্তদের কাছে পথিকের অবস্থান প্রকাশ করেন। পরিণামে পথিক দুবৃত্তদের দ্বারা নিহত হয়। নিরপরাধ

পথিকের মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য কৌশিককে পাপ স্পর্শ করে এবং তিনি সত্য কথন সত্ত্বেও স্বর্গলাভ থেকে বঞ্চিত হন। কোন কোন পরিস্থিতিতে সত্যকথন অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম যে পরিহার্য এই কাহিনী তার প্রমাণ।

কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে কোন্ ধর্মটি পালনীয় তার নির্দেশ আবশ্যক হয়। যেমন, কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করার এবং ভরতের সিংহাসনপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করলে লক্ষ্মণ সক্রোধে বলেন যে রামের সিংহাসন যদি অন্য কোন ব্যক্তি অধিকার করে তাহলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। রাম তখন তাঁকে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে নিষেধ করেন অর্থাৎ তিনি অগ্রজের সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করার জন্য ক্ষত্রিয়ের মতো শৌর্য প্রদর্শনে উদ্যত হলে রাম তাঁকে সাধারণ ধর্ম পালন করতে নির্দেশ দেন। সাধারণ ধর্ম এই যে পিতৃসত্য পালন করাই পুত্রের ধর্ম। এইভাবে এখানে রাম বর্ণাশ্রম ধর্মের তুলনায় সাধারণ ধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেন।

আবার গীতায় দেখা যায় যে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করছেন কারণ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম বা স্বধর্ম। কিন্তু অর্জুনের মতে যুদ্ধে যোগদান করলে কতকগুলি সাধারণ ধর্মকে অগ্রাহ্য করা হবে। এখানে কৃষ্ণ সাধারণ ধর্মের তুলনায় বর্ণধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি ধর্মাচরণের পরিস্থিতিসাপেক্ষতাকে প্রমাণ করে। সাধারণ ধর্মপালন মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তব্যতা নয়। সাধারণ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলেও আমরা নৈতিক দ্বিকল্পের সম্মুখীন হই। শাস্ত্রকারগণ অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে 'আপৎ-ধর্মের' ধারণার উল্লেখ করেন। যেখানে জীবন সংশয়ের প্রশ্ন আছে অথবা যেখানে বিপদের আশঙ্কা আছে সেখানে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আপৎধর্মই পালনীয়।

স্বধর্মের ধারণা— 'স্বধর্ম' শব্দের অর্থ নিজের ধর্ম বা নিজের বর্ণগত ধর্ম। স্বধর্ম বাস্তবিক বর্ণাশ্রমের অতিরিক্ত কোন ধর্ম নয়। একটি বর্ণের অন্তর্গত মানুষের সেই বর্ণগত যে ধর্ম তাই তার স্বধর্ম। যেমন, ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষের যুদ্ধ করা বা স্বদেশকে সুরক্ষিত রাখাই স্বধর্ম। বৈশ্য যেহেতু বণিক শ্রেণীভুক্ত তাই ব্যবসা-বাণিজ্য করাই তার স্বধর্ম। এইভাবে প্রত্যেক মানুষ যে বর্ণের অন্তর্গত সেই বর্ণের ধর্ম বা কর্তব্যই তার স্বধর্ম।

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে 'স্বধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত তাই যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াই তাঁর স্বধর্ম। অর্জুন যদি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন তাহলে তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন। স্বধর্ম পালন করতে প্রত্যেক মানুষই দায়বদ্ধ থাকে। অর্জুন ক্ষাত্রধর্ম

পালনের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এর থেকে বোঝা যায় যে স্বধর্মের ধারণা বর্ণধর্মের ধারণা থেকে ভিন্ন নয়।

স্বধর্ম পালন করাকে একজন ব্যক্তির কর্তব্য বলা হয়েছে কেন— একথা বিচার করা প্রয়োজন। উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে বর্ণধর্মে বস্তুত সমাজের বিভিন্ন মানুষের বৃত্তিগত কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। একজন মানুষ একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষ বলেই তাকে একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একজন ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ শৌর্যবীর্যের অধিকারী বলেই সে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণেই যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া তার স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন— স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। একথার গভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে। যে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত সে যদি ব্রাহ্মণের বা বৈশ্যের কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করে তাহলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়; শূদ্র বাণিজ্যে অপটু। তাই কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করলে কোন ব্যক্তিই সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। মানুষের কর্তব্য তার সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

স্বধর্ম মানুষের বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতার মূল তার স্বভাবগত দক্ষতার মধ্যে নিহিত। মানুষ তার নিজস্ব বর্ণনিষ্ঠ কর্মে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সহজেই বোঝা যায় যে স্বধর্ম বাস্তবিক বর্ণ ধর্মেরই নামান্তর।

আশ্রম ধর্ম

'আশ্রম' শব্দটি জীবনের এক একটি অধ্যায়কে বোঝায়। প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত জীবনকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রম লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে মোক্ষ লাভ করাকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য জীবনের নানা প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়নি। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভ করবে— একথা যেমন সত্য সেইরকম তার যে একটি জৈব সত্তা আছে সেকথাও একইভাবে সত্য। মানুষের জীবন এই জৈব সত্তা থেকে পারমার্থিক সত্তায় উত্তরণের ইতিহাস। চারটি আশ্রমধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সেই উত্তরণ ঘটে।

আশ্রমধর্ম বলতে প্রতিটি আশ্রমের কর্তব্যকে বোঝায়। মানুষ জীবনের এক একটি পর্যায়ে এক একটি আশ্রমে অবস্থান করে। আশ্রমভেদে তার কর্তব্যও ভিন্ন হয়। একটি আশ্রম ধর্ম পালন করে মানুষ তার পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। চারটি আশ্রম অতিক্রম করে মানুষ মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মচর্য— ব্রহ্মচর্যই মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে। ব্রহ্মচর্যকে মানুষের শিক্ষালাভের অধ্যায় বলা হয়েছে। গুরুগৃহে বেদবিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীর চরিত্র গঠিত হয়। আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় সংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে প্রাক্‌বিবাহের সংযত জীবনকে যদিও ব্রহ্মচর্য বলা হয় তাহলেও 'ব্রহ্মচারী' শব্দটির আর একটি প্রাসঙ্গিক অর্থ আছে। ''ব্রহ্মাণি চরতি ইতি ব্রহ্মচারী''— সেই ব্যক্তিকেই ব্রহ্মচারী বলা যায় যে জীবনের সমস্ত কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মভাবনায় লীন থাকে। অবশ্য এর জন্য মানুষকে সংযতেন্দ্রিয় হতে হবে। সংযত জীবনে প্রাণশক্তির স্ফুরণ হয় যা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথে নিয়ে যেতে পারে।

ব্রহ্মচর্য যেহেতু শিক্ষালাভের পর্যায় তাই শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংযম ছাড়াও ব্রহ্মচারীর আরও কিছু কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে, যেমন, গুরুর শুশ্রূষা, খাদ্য প্রস্তুতি বা রন্ধনের জন্য ইন্ধন আহরণ, হোমাগ্নির অর্চনা এবং ভিক্ষা সংগ্রহ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এই সমস্ত দায়িত্ব ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীর পালনীয়।

গার্হস্থ্য— ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবসানে মানুষ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে। গৃহাশ্রমে বিবাহিত জীবন বা সংসার জীবনকে গার্হস্থ্যাশ্রম বা কৃতদার গার্হস্থ্য বলা হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করে মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। বংশধারাকে অব্যাহত রেখে মানবজাতির প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখা গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য। সাংসারিক বা পারিবারিক জীবন মানুষের জৈব তৃষ্ণা নিবৃত্তির স্থান নয়। সংযত বিবাহিত জীবনযাপন করে মানুষ নিজেকে পরবর্তী আশ্রমের জন্য প্রস্তুত করে।

প্রতিটি আশ্রমেই যেহেতু মোক্ষ লাভের প্রস্তুতি চলে তাই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এখানে সংযত। এই আশ্রমে বংশবৃদ্ধি ছাড়াও মানুষকে আরও বহুবিধ কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন পিতামাতার সেবা, সন্তানের প্রতিপালন, অতিথিসেবা, দেবপূজা ইত্যাদি। মানুষ এই গার্হস্থ্য আশ্রমেই তার মৌলিক ঋণশোধ করার চেষ্টা করে— যেমন, দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ। প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সূর্য, বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতি নানা দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাগযজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে। তাছাড়া উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়েও মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে।

সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মানুষ গার্হস্থ্য জীবনে পিতৃঋণ শোধ করে। বেদাধ্যয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ শোধ হয়। এইভাবে জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সংস্কৃতি অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচে।

গার্হস্থ্য আশ্রমে মানুষকে নানাবিধ মহাযজ্ঞ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে— যেমন, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ।

'ভূতেভ্যঃ বলিপ্রদানম্ ভূতযজ্ঞঃ'— যাবতীয় ভূতদ্রব্যের, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেবা ও সংরক্ষণের জন্য বলিপ্রদান করাই ভূতযজ্ঞ।

'অতিথিপূজনম্ মনুষ্যযজ্ঞঃ'— অতিথির সেবা করা গৃহস্থের কর্তব্য। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করাই মনুষ্যযজ্ঞ।

'হোমঃ দেবযজ্ঞঃ'— দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম অনুষ্ঠান করাই দেবযজ্ঞ।

'শ্রাদ্ধম্ পিতৃযজ্ঞঃ'— প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা পিতৃযজ্ঞ। এইভাবে পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় ও তাঁদের স্মরণ করা হয়, কারণ তাঁরাই আমাদের যাবতীয় মঙ্গলের হেতু।

'বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞঃ'— পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়।

পঞ্চবিধ যজ্ঞের ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে ঋণশোধাত্মক। মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ঋণে আবদ্ধ হয়ে থাকে। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মানুষ তার বিভিন্ন ঋণ পরিশোধ করে। ভারতীয় শাস্ত্রে সর্বসমেত পাঁচ প্রকার ঋণের উল্লেখ পাওয়া যায়— দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, নৃঋণ এবং ভূতঋণ। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাগযজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে। সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মানুষ গার্হস্থ্য জীবনে পিতৃঋণ শোধ করে। বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ পরিশোধ হয়। যে মানুষ আমাদের সাহায্য প্রার্থী বা যে ব্যক্তি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছে তার সেবার মাধ্যমে নৃঋণ পরিশোধ হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেবার মধ্য দিয়ে ভূতঋণ শোধ হয়।

বানপ্রস্থ— গার্হস্থ্য জীবন সার্থকভাবে সমাপ্ত হলে মানুষ তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থে প্রবেশ করে। বানপ্রস্থে মানুষ যেন স্বেচ্ছানির্বাসনে যায়। গার্হস্থ্য আশ্রমে জীবনের ভোগ ও নানা কর্তব্য সমাপ্ত হলে মোক্ষলাভের প্রয়োজনে মানুষ কৃচ্ছ্র-সাধনে ব্রতী হয়। কৃচ্ছ্রতায় মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, নিরাসক্তি আসে এবং সে তখন ত্যাগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলে মানুষ সাধনমার্গের উচ্চতম স্তর সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ তিনি গৃহ থেকেও বাণপ্রস্থের কর্তব্য পালন করেন। এই আশ্রমে নিরাসক্তি ও সংযম সাধনার উপযোগী কয়েকটি কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— যেমন, বল্কলাদি ধারণ, কেশাদি ধারণ, বন্য ফলমূল ভোজন এবং অতিথি শেষ ভোজন অর্থাৎ অতিথির ভোজনের পরে অবশিষ্ট বস্তুর ভোজন।

সন্ন্যাস— সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে বানপ্রস্থ পূর্ণতা লাভ করে। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে অবস্থান করেন না।

বিচরণ-ই যেহেতু সন্ন্যাস আশ্রমের রীতি তাই সন্ন্যাসকে প্রব্রজ্যা বলা হয়। যিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তিনি গৃহহীন বা অনিকেত। উপনিষদে সন্ন্যাসের লক্ষণে বলা হয়েছে যে, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করেন, যিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর জীবন নিরাসক্তির সাধনায় নিমগ্ন থাকে।

সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি প্রথমত শ্রদ্ধাবান এবং মানসিক প্রশান্তির অধিকারী। দ্বিতীয়ত তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি অভয়দাতা। তৃতীয়ত তিনি তাঁর সমস্ত কর্মের নাশপূর্বক যম-নিয়মাদি পালন করেন। 'যম' শব্দটি নিম্নলিখিত ধর্মগুলিকে বোঝায়— অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য। 'নিয়ম' এর অর্থ নিম্নলিখিত ধর্মগুলি— শৌচ, সন্তোষ, তপস্, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান।

উপরোক্ত ধর্মগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে 'যম' প্রধানত আত্মসংযমমূলক। যেমন অহিংসার অর্থ হিংসাপ্রবৃত্তিকে সংযত করা। সত্য পালনও অসত্য থেকে বিরতিকে বোঝায়— যা একপ্রকার সংযম। অপরপক্ষে 'নিয়ম' আত্মোপলব্ধির সহায়ক। 'যম'-এর ধারণা নেতিবাচক হলেও নিয়মের ধারণা সদর্থক।

আশ্রমধর্ম প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে যতই ক্রমশ মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হতে থাকে ততই তার নৈতিকতারও স্ফুরণ হতে থাকে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবেশ করে মানুষ যে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে তা নয়। সে নৈতিকতার একটি স্তর থেকে ক্রমশ আরও উন্নত স্তরে প্রবেশ করে যার চরম আদর্শরূপে ব্রহ্মজ্ঞান কল্পিত হয়েছে।

উপসংহার

ধর্ম সমগ্র সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে— একথা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও বিশেষভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক আধুনিক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষাগুরু, ক্ষত্রিয় সমাজ সংরক্ষক, ইত্যাদি। বর্ণাশ্রম ধর্মে একথাই প্রচারিত হয়েছে যে মানুষের দক্ষতা ও প্রবণতার নিরিখেই তার কর্তব্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। বস্তুত আলোচ্য তত্ত্ব অনুযায়ী কর্তব্যের ধারণার মূলে আছে অধিকারের ধারণা, এবং বর্ণ ও আশ্রমের দ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ধারিত হয়।

কিন্তু যে প্রশ্নটি বিতর্কের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে সেটি এই যে বর্ণ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়— জন্মের দ্বারা? অথবা গুণ ও কর্মের দ্বারা? ভগবদ্গীতায় গুণ ও

কর্মকেই বর্ণের নিয়ামক বলা হয়েছে। কিন্তু গুণ ও কর্মের ভিত্তি বা নিয়ামক কি? ভারতীয় দর্শনে মনে করা হয় যে জন্মই মানুষের গুণ ও কর্মের নিয়ামক। কিন্তু একথা সহজে স্বীকার করা যায় না। মানুষ যদি জন্মসূত্রেই অসমান হয় এবং জন্মের দ্বারাই যদি তার প্রবণতা ও দক্ষতা নির্ধারিত হয়, তাহলে তাদের ধর্ম বা কর্তব্যও যে ভিন্ন ভিন্ন হবে একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু জন্মই কি মানুষের প্রবণতা ও দক্ষতাকে নির্ধারণ করতে পারে? আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় একথার সমর্থন পাওয়া যায় না। একটি বিশেষ বর্ণের মানুষের মধ্যে আমরা অন্য বর্ণের মানুষের প্রবণতা লক্ষ করেছি। বর্ণধর্মের ব্যবস্থা সকল মানুষের কাছে সমস্ত সম্ভাবনার সুযোগ উন্মুক্ত করে না। তাই বর্ণধর্মের ধারণায় অনেকে অযৌক্তিক বৈষম্যের আশঙ্কা করেছেন।

একথা সম্ভবত ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য যে প্রাচীন যুগে বর্ণধর্মের মধ্যে কঠোর রক্ষণশীলতা ছিল না। বর্ণবিভাগ অতীতে যথেষ্ট শিথিল ছিল। তখন প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হওয়ার সুযোগ ছিল। শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণের চারিত্রিক লক্ষণ দেখা গেলে তাকে ব্রাহ্মণ বর্ণের বলে স্বীকার করার অনেক নিদর্শন আছে। আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি শূদ্রের লক্ষণ প্রকট হত তাহলে ব্রাহ্মণের সামাজিক পতন অনিবার্য ছিল। সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি লক্ষণ যদি কোন শূদ্রের মধ্যে প্রকটিত হয় তাহলে সে আর শূদ্র থাকে না; সে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়। সুতরাং বোঝা যায় যে জন্ম নয়, গুণ ও কর্মই বর্ণের নির্ধারক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বর্ণ বিভাজনে এই গতিশীলতা পরবর্তীকালে লোপ পায় এবং বর্ণ ব্যবস্থাকে জন্মভিত্তিক বলে ঘোষণা করা হয়। এর সাক্ষাৎ পরিণাম কঠোর জাতিভেদ প্রথা। জন্মসূত্রে যে শূদ্র তার ব্রাহ্মণত্বের আস্বাদ গ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকল না।

বর্ণধর্মকে এই কারণে 'সাধুধর্ম' বলা যায় না। যদি জন্মের পরিবর্তে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ ব্যবস্থা নির্ধারিত হয় তাহলেই তা সাধুধর্মরূপে গ্রাহ্য হতে পারে। মানুষের গুণ ও কর্ম জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তাছাড়া গুণ ও কর্ম অপরিবর্তনীয় নয়। গুণ ও কর্ম কঠোরভাবে জন্মের দ্বারাই নির্ধারিত হয়— এই ধারণা সমাজে শুধুই বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। ভারতীয় ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে বর্ণ ব্যবস্থা গতিশীল না হওয়ায় এই আশঙ্কার অবকাশ থেকে যায়।

অর্থ

পুরুষার্থ প্রসঙ্গে 'অর্থ' বলতে জীবিকা অর্জনের উপায়কে বোঝানো হয়। বিষয়-সম্পত্তি, জীবনধারণের আর্থিক উপকরণ সবই অর্থ। মহাভারতে অর্জুন ত্রিবর্গের

মধ্যে অর্থের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। সেখানে বলা হয়েছে "অর্থেভ্যো ... বিবৃদ্ধেভ্যঃ"। অর্থই সমৃদ্ধি আনে। চাণক্য বলেছেন— 'ধর্মস্য মূলম্ অর্থঃ'।

অর্থ লাভের উপায় কি? মহাভারতে বলা হয়েছে যে উত্থানশক্তির সাহায্যেই ... লাভ হয়। 'উত্থান' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেও একথা সমর্থন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে 'অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্'— প্রচেষ্টাই অর্থের মূল। মানুষের শারীরিক দক্ষতাকেই উত্থান বা প্রচেষ্টার উৎস বলা হয়। প্রাচীন ... দৈহিক ক্রিয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে দৈহিক দক্ষতা ... পটুতার চেয়ে আর কিছুই বড় নয়। কৃষিকাজ, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্পে মানুষের এই দক্ষতা প্রকাশিত হয় যার ফলে অর্থ সঞ্চিত হয়।

ক্ষত্রিয় অর্জুন মহাভারতের শান্তি পর্বে উদাসীন যুধিষ্ঠিরকে অর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে "ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন— এই সমস্ত কিছুই অর্থের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। পর্বত থেকে যেমন অনেক নদী ধারা বেরিয়ে আসে তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা, ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম, স্বর্গ এবং এই অর্থ থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়।"[১]

তবে অর্থ বলতে এমন কোন সম্পদকে বোঝানো হয় না যা অন্যায়ভাবে সংগৃহীত। চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ, অসদুপায়ে বা শোষণের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। তার কারণ এই যে, অর্থ পুরুষার্থ হলেও যে অর্থ অনৈতিক পথে সঞ্চিত তা পুরুষার্থ নয়। 'অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থকে এই কারণে "অর্থদূষণ' বলা হয়েছে। সুতরাং সেই অর্থই পুরুষার্থ যা ন্যায়পথে অর্জিত। মানুষের পক্ষে এমনভাবে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয় যা অন্যের ক্ষতিসাধন করতে পারে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নিজের অন্যায় লাভ এবং অপরের অনিষ্ট যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত (ইষ্ট-অনিষ্ট-বিমুক্ত)।

অর্থ বৈধ বা ন্যায়লব্ধ হওয়া উচিত হলেও এই বৈধতা জানার উপায় কী? যে অর্থ দান করা যায় অথবা যা যজ্ঞে ব্যবহৃত হতে পারে তাই বৈধ অর্থ। একমাত্র যে অর্থ সৎপথে অর্জন করা হয়েছে তাই দানের যোগ্য। অন্যায়ভাবে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সেই অর্থে কৃত যজ্ঞ ফলদান করে না। সুতরাং সৎপথে সঞ্চিত অর্থ যা সঞ্চয়কালে কোন মানুষের অনিষ্টের হেতু হয়নি বা যার দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রতারিত হয়নি সেই ন্যায়লব্ধ অর্থই প্রকৃত অর্থ। "অর্থ" শব্দটির দ্বারা এমন কোন বিত্তকে বোঝানো হয়নি যার সাহায্যে মানুষ অসংযত জীবনযাপন করতে পারে। মিতব্যয়ের মাধ্যমে জীবনযাপন ও সদ্বস্তু লাভের জন্যই অর্থ সংগ্রহ করাকে শাস্ত্র অনুমোদন করেছে।

১। দশুনীতি— নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতটা অর্থ আবশ্যক তার অধিক অর্থ সঞ্চয় করা উচিত নয়। ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন ততটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কামনা করে সে অপরাধী। ব্যবহারেই অর্থের সার্থকতা। সুতরাং নিজের প্রকৃত প্রয়োজনে এবং অন্যের উপকারে অর্থ ব্যয় করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের স্বার্থে এবং পরার্থে অর্থ ব্যয় করে না, সে কৃপণ। কার্পণ্য মানুষের সামাজিক সত্ত্বাকে ক্ষুণ্ণ করে। এইভাবে ভারতীয় নীতিদর্শনে অর্থ এবং অর্থ ব্যবহারের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অর্থের এই সংযত ব্যবহারের জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। ধর্ম শুধুমাত্র কামের নিয়ন্ত্রক নয়, অর্থেরও নিয়ন্ত্রক। ধর্মই মানুষকে সংযত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থের সদ্ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মের নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব। অর্থ যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা পরম পুরুষার্থ মোক্ষের অভিমুখে নিয়ে যায়। বস্তুত মোক্ষই সেই আদর্শ যা অর্থলাভকে সার্থক করতে পারে।

কাম

"কাম" শব্দটির সাধারণ অর্থ কামনা, প্রেম, ইন্দ্রিয়সুখ, লোভ প্রভৃতি। পুরুষার্থের অঙ্গরূপে কামকে এই অর্থে নেওয়া হয় না। সেখানে মানুষের পশু প্রবৃত্তি, লালসা প্রভৃতি বাধাহীন চরিতার্থতা চায়। সাধারণ অর্থে যখন "কাম" শব্দটিকে বিচার করা হয় তখন দেখা যায় যে, কাম যেন একটি প্রবৃত্তি যা চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ। কিন্তু প্রশ্রয় পেলে কাম তৃপ্ত ও প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান হয়। মানুষ যতই ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে ইন্দ্রিয়ের ভোগলিপ্সা ততই বৃদ্ধি পায়।

যে কাম অসংযত পরিতৃপ্তি কামনা করে সেই কাম প্রকৃতপক্ষে লালসা। লালসা মানুষের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। অর্থের ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে সেইরকম কামের ক্ষেত্রেও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্মই কামকে অর্গলবদ্ধ করে। কাম মূলত গার্হস্থ ধর্ম। তাই ধর্ম কামকে মানুষের গার্হস্থ জীবন থেকে নির্মূল করতে চায় না। ধর্ম কামকে ততটাই প্রশ্রয় দেয় যতটা তা মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। মানুষমাত্রই চায় নিজের বংশধারাকে অব্যাহত রাখতে। কাম মানুষের একটি জৈব প্রবৃত্তি হলেও তার উদ্দেশ্য হল বংশগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে সংসারচক্রের গতি রুদ্ধ না হয়।

ত্রিবর্গের অন্তর্গত অর্থ এবং কামের মধ্যে সম্পর্কটি অতি নিবিড়। কাম মানুষকে জীবনধারণের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত করে। কাম শুধুই ভোগ বা ইন্দ্রিয়

পরিতৃপ্তিকে বোঝায় না। মানুষের জীবনধারাকে প্রবাহিত করে তাকে সংরক্ষণ করাই কামের উদ্দেশ্য।

কোনো কোনো উপনিষদে বলা হয়েছে যে, কাম মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। কামের ফলে আসে কর্ম সংকল্প; তার থেকে আসে প্রযত্ন। "কাম যদি শুধু ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে কোনো সংকল্পের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয় তবে সেই কামই তার পূর্বপুরুষার্থ অর্থকে বহন করে নিয়ে আসতে পারে...কাম যদি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের ইষ্টলাভে সহায়তা করে, তবে সেই কামই পুরুষার্থ।"[২]

মোক্ষ

চতুর্বর্গের অন্তর্গত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে। তার কারণ মানুষকে মোক্ষের অভিমুখী করে তোলাই অন্য পুরুষার্থগুলির উদ্দেশ্য। মোক্ষ লাভের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। এইদিক থেকে বিচার করে শাস্ত্রকাররা মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলেছেন। একমাত্র মোক্ষই একটি পুরুষার্থ যা নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান।

মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলার অপর একটি কারণও আছে। আমরা জানি যে প্রতিটি পুরুষার্থই সুখপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত। তবুও একথা সত্য যে ধর্ম, অর্থ ও কাম সাক্ষাৎ সুখ নয়, সুখের হেতু। কিন্তু মোক্ষ সাক্ষাৎ সুখস্বরূপ। এইজন্য মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়। 'পরম' শব্দের অর্থ 'নিরতিশয়' অর্থাৎ যার অধিক সুখ হয় না এবং যার কখনও ক্ষয় হয় না। মোক্ষ যেহেতু সর্বোত্তম এবং অক্ষয় সুখস্বরূপ তাই মোক্ষ পরম পুরুষার্থ।

মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলার দ্বিতীয় কারণ এই যে এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'ন চ পুণরাবর্ততে'। শ্রুতিবাক্যটির অর্থ এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্ত জীবের বারবার শরীর গ্রহণের জন্য জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা মোক্ষের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়।

ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই তিনটি পুরুষার্থ নিত্য নয়— এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও শ্রুতি এই দু'প্রকার প্রমাণ আছে। অর্থ এবং কাম পুরুষের সুখজনক এ বিষয়ে সংশয় নেই; কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে এ দুটি পুরুষার্থের দ্বারা যা উৎপন্ন হয় তা বিনাশশীল। আত্মাই একমাত্র অবিনাশী এবং আত্মা থেকে ভিন্ন অন্য সমস্তই যে বিনাশী এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে।

২। *দণ্ডনীতি*— নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

ধর্মের অনিত্যত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে। ধর্মাচরণের দ্বারা পুণ্যরূপ যে অদৃষ্ট বা অপূর্ব উৎপন্ন হয় তার ফলে মরণোত্তর স্বর্গাদি সুখের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ধর্মাচরণও একপ্রকার কর্ম এবং কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত ফল যে অনিত্য হয় একথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ— যেমন, কৃষিকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত শস্য অথবা রাজসেবা দ্বারা প্রাপ্ত ধন উপভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। একইভাবে পুণ্য কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলেরও ক্ষয় হয়। অর্থ ও কামের সঙ্গে ধর্মের ফলও যে অনিত্য এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যেমন, 'তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামূত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে', অর্থাৎ ইহলোকে কর্মের দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরকম পরলোকে পুণ্যকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব অর্থ ও কামের মতো ধর্মও অনিত্য। উল্লিখিত শ্রুতিতে অবশ্য ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত ফলের অনিত্যত্ব সাধিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মের নাশ না হলে ধর্মফলের নাশ হয় না। সেইজন্য শ্রুতির দ্বারা ধর্মফলের ন্যায় ধর্মেরও নাশ সূচিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই শ্রুতির দ্বারা পরোক্ষভাবে ধর্মের নাশ বা অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শ্রুতি সাক্ষাৎভাবে ধর্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করে। যেমন 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'— এই শ্রুতিবাক্য সাক্ষাৎভাবে ধর্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করে। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র মোক্ষই যেহেতু নিত্য ও সুখস্বরূপ তাই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে।

মোক্ষ যে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তিদান করে এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা একমত। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? —এই জিজ্ঞাসা থেকেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম হয়েছে। মোক্ষ সেই জিজ্ঞাসার উত্তর। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি সংসার যাপন করেছিলেন, যিনি ধর্মাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন তিনিই জীবনের শেষ পর্যায়ে বৈরাগ্য ও অনাসক্তি যোগ অভ্যাস করেন। এই অনাসক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত করায় ধর্ম। আমরা জানি ধর্মের অনুশাসনের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। সমাজ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্ম মানুষের কাম ও অর্থলিপ্সাকে সংযত করে। এই সংযম মানুষকে মোক্ষের পথে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করে।

অনেকে মনে করেন যে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ সমপর্যায়ের নয়। ত্রিবর্গ মানুষের নানা কামনাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মোক্ষে কোন বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না; কারণ বাসনার উচ্ছেদই মোক্ষ। তাই ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই ত্রিবর্গ থেকে মোক্ষের ধারণা অত্যন্ত ভিন্ন বলে মনে হয়।

আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেকে বলেছেন যে প্রথম তিনটি পুরুষার্থ বা ত্রিবর্গ যেন মানুষের সামাজিক আদর্শ। অর্থ ও কাম ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম

আমাদের যে সমস্ত নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করে তা মূলত কতকগুলি সামাজিক অনুশাসন। সুতরাং পরোক্ষভাবে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থকেও সামাজিক আদর্শ বলে গণ্য করা চলে। অপরপক্ষে মোক্ষ একটি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আদর্শ। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষ সমপর্যায়ের নয়।

কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে মোক্ষ মানুষের জীবনের এমন একটি পর্যায় যেখানে মানুষ সংসারের আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মোক্ষ মানুষকে জগৎ থেকে বিযুক্ত করে না, জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করে। অনেকে মনে করেন যে মোক্ষের আদর্শ জীবমুক্তি। মোক্ষ জীবন থেকে মুক্তি নয়; বরং মোক্ষ এই জগতেই এমন এক জীবনের সূত্রপাত করে যা নিরাসক্ত, নির্মোহ।

মানুষের জীবন অখণ্ড। তবুও এই জীবন নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এক ধারাবাহিক প্রবাহের মতো চলে। প্রতিটি পর্যায়েই মানুষের জীবনাদর্শ হল পূর্ণতা। মোক্ষ জীবনে এই পূর্ণতা আনে। যে জীবন মোক্ষ প্রাপ্ত সেই জীবন জগৎকে পরিত্যাগ করে না। তাই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ অঙ্গীভূত হয়েছে। আসলে ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ত্রিবর্গের আদর্শ তাই মোক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে না, বরং তা পূর্ণতর হয়ে ওঠে।